অবিশ্বাস্য

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

BANGLADARSHAN.COM

॥অবিশ্বাস্য॥

চক্ষুকে বিশ্বাস করতে পারছিলাম না।

আমি দরিদ্র স্কুল-মাস্টার। চাকুলিয়া এরোড্রোমের চিফ্ এন্‌জিনিয়ারের তক্‌মা-পরা উর্দি-আঁটা চাপরাসী নামলো যে স্টেশন-ওয়াগন থেকে সে স্টেশন-ওয়াগন আমার খোলার বাড়ির দোরে কেন? এগিয়ে গেলুম। কি ব্যাপার চাপরাসী সাহেব? কোথা থেকে আসা হচ্ছে? ভুল করনি তো?

—আপ্‌কো নাম আছে চাটর্জি বাবু? ইস্কুল-কা মাস্টার? একঠো চিট্টি হ্যায় বড়া সাব্‌কা, আপ্‌কা নামমে।

—কোন্ এন্‌জিনিয়ার সাব্, চাকুলিয়া এরোড্রোম।

—হ্যাঁ, আমারই নাম শৈলেন চট্টোপাধ্যায়।

—এস. এন. চাটর্জি—এহি লিজিয়ে—ঠিক হুয়া, ওহি নামমে চিট্টি হ্যায়।

অ্যাঁ?...বলে কি। আমার নামের চিঠি। তাতে লেখা আছে:

BANGLADARSHAN.COM

"ভাই বগ্‌দা, অনেক কষ্টে তোর সন্ধান পেয়েছি। তোর 'বগদা' নাম আমরাই দিয়েছিলাম মনে আছে? তুই এখানে মাস্টারি করিস শুনলাম। তাই গাড়ি পাঠালুম। বৌ ও ছেলেমেয়েদের নিয়ে চলে আসবি, এখানেই খাবি রাত্রে। গাড়ি করে পাঠিয়ে দেবো। আসা চাই—একা নয় কিন্তু, সস্ত্রীক। ইতি—তোদের ধীরেন রায়।

ঘাটপাত্‌লে হাই-ইস্কুল। আমার মাসীর বাড়ি। মেসোমশায় আমায় ভাল চোখে দেখেন নি কখনো। তাঁর কড়া, নির্মম শাসন, হৃদয়হীন শাস্তি। মাসীমার খিট্‌খিটে মেজাজ, বেশি ভাত খাই বলে দুবেলা পাকেপ্রকারে অনুযোগ। সহপাঠীরা 'বগ্‌দা' বলে খেপাতো। পেট ভরে খেতে পেতাম না। কাপড় সেলাই করে পরতে হত।

কিন্তু ধীরেন রায় কোন্ ছেলেটি? আজ পঁচিশ বছর আগেকার বিস্মৃতপ্রায় স্কুল জীবনের দিনগুলির কুয়াশার মধ্যে ধীরেন বলে কোনো ছেলের মুখ তো স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠলো না চোখের সামনে? নাম সব ভুলে গিয়েচি। চুয়াল্লিশ পঁয়তাল্লিশ বয়েস হল। পনেরো-ষোল বছরের কথা কত মনে আছে, বিশেষত এই দরিদ্র জীবনে।

সুহাসিনী শুনে হঠাৎ বড় ভয় পেয়ে গেল। অত বড়লোকের বাড়ি যাওয়ার উপযুক্ত শাড়ি নেই, গহনা তো দুগাছা ব্রোঞ্জের ওপর সোনার কাজ-করা চুড়ি। তাই নিয়ে তাড়াতাড়ি লাল কলকা-পাড় একমাত্র ভাল শাড়িখানা, যা কি-না বৃটিশ ফ্ল্যাগের মত সর্বজনবিদিত, পরিবর্তনহীন ও অকাট্য হয়ে উঠেচে, পরে উঠলো ছেলেমেয়ের হাত ধরে গাড়িতে।

গবর্ণমেন্টের গাড়ি হু হু বেগে ছুটলো মাঠ-বনের পাশ কাটিয়ে চওড়া পিচঢালা রাস্তা বেয়ে। স্টেশন-ওয়াগনের মধ্যে তিনটি গদিমোড়া বেঞ্চি—হাত পা মেলে দিব্যি বসা গেল।

সুহাসিনী জীবনে এতদূর মোটরগাড়ি চড়ে যায় নি কখনো। সে এবং ছেলেমেয়েরা খুশি উপ্‌চে-পড়া চোখগুলো বড় বড় করে জানলা দিয়ে দ্রুত চলমান গাছপালা, পাথর, ঝরণার দিকে চেয়ে ছিল। মাঝে মাঝে বলছিল—হ্যাঁগা, আমরা ক'মাইল এলাম? ঐ ঘরখানাতে কারা আছে? দ্যাখো দ্যাখো কি চমৎকার ফুল ফুটে আছে বনে! আচ্ছা, এটা কি নদী? আর কদ্দুর আছে? বেশ সিনারি এ জায়গাটার, না? ওটা কি পাহাড়? ঐ যে বন ধুঁধুলের ফুল ফুটে আছে দেখলাম, ও ধুঁধুল কি তরকারী রেঁধে খায়? জবার জামাটা খুব ময়লা না তো? তাকিয়ে দ্যাখো তো! বাঃ কি সুন্দর ঢালু পাহাড়টা! দ্যাখো দ্যাখো—পাহাড়ের ওপর ওটা কি গাছ? কুসুম গাছ?...

চাকুলিয়া এরোড্রোমে গাড়ি পৌঁছে গেল। তার পরও পাঁচ মিনিট চলার পর একটা সাদা বড় বাংলোর সামনে হর্ণ দিয়ে গাড়ি দাঁড়াতেই ফুল-প্যান্ট ও হাতগোটানো কামিজপরা এক ভদ্রলোক হাসিমুখে বাংলোর বারান্দায় দেখা দিলেন, তাঁর পেছনে একটি ভদ্রমহিলা এসে দাঁড়ালেন, ছোট-বড় ছেলেমেয়ে সঙ্গে। সুহাসিনীর মুখ চুণ হয়ে গিয়েচে দেখলাম, বেচারী এমন বড়লোকের বাড়িতে নিমন্ত্রণে কখনো আসেনি, দেখে শুনে ঘাবড়ে যাওয়া অস্বাভাবিক নয় ওর পক্ষে।

BANGLADARSHAN.COM

—আরে এই যে, আয় বগ্‌দা! এসো এসো বৌ-ঠাকরুণ! ওগো, এই দ্যাখো আমাদের বগ্‌দা! তারপর—সব ভাল? একটি ছেলে, দুটি মেয়ে? বেশ বেশ...থাক্ থাক্, এসো বাবা, সুখে থাকো,—ইনি তোমাদের কাকী-মা হন, প্রণাম করো।

আমি এতক্ষণ অবাক হয়ে সাহেবী-পোশাক-পরা ব্যক্তিটির দিকে চেয়ে ছিলুম। আরে, এ দেখচি আমাদের ক্লাসের সেই হাজু! যে সেকেন্ড মাস্টারের অঙ্কের পিরিয়ডে নিয়মিত টাস্কের খাতা দেখাতো, একদিনও বাদ দিত না বলে মনে আছে সেকেন্ড মাস্টার ওকে বড্ড ভালবাসতেন। কিন্তু নীলমণি মিত্রের ইংরিজির পিরিয়ডে হাজু পেছনের বেঞ্চিতে আত্মগোপন করতো কোথায়, একদিন একটাও পার্সিং করতে শুনিনি ওর মুখে। আর মনে আছে ফুটবল খেলতে গিয়ে স্কুলের মাঠে ওর হাড় ভেঙ্গে গিয়েছিল। মাস খানেক সেজন্য হাসপাতালে ছিল। মেয়েরা চলে গেল বাড়ির মধ্যে, আমি ও হাজু বসে বসে কত পুরনো কথা বলতে লাগলুম। ঘণ্টা খানেক কেটে গেল। হাজুর বড় মেয়ে চা ও খাবার দিয়ে গেল আমাদের দুজনের।

মিথ্যে কথা বলবো না, অনেকক্ষণ থেকে এই খাবারের প্রতীক্ষায় উদ্‌গ্রীব হয়ে ছিল ক্ষুধাতুর মন। তা খাবার এলো ভালই—লুচি, বেগুন ভাজা, ইলিং মাছ ভাজা, সন্দেশ, রাবড়ি। পরিশেষে চা।

হাজু বললে—সব বাড়ির তৈরি। গৃহিণী ভাল রাঁধিয়ে—ওই মস্ত এক সুখ।

—কই, তোর বৌয়ের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিবি তো?

–চল, বাড়ির মধ্যে। খাবার-টাবার তৈরি করছিল। রাত্রে এখানে খেয়ে যাবি কিন্তু।

–এই তো ভাই যথেষ্ট পেটভরা খাওয়া হল। আবার রাত্রে কি খাবো?–কথাটা কিন্তু আদৌ অতিরঞ্জিত বলিনি।

চা খাওয়ার পর হাজু বললে–চল্–এরোড্রোমের রান্-ওয়ে দেখিয়ে নিয়ে আসি।

–বৌকেও নিয়ে যাবো?

–হ্যাঁ হ্যাঁ, নিশ্চয়। ফ্ল্যাস্কে করে চা নিয়ে যাব, সেখানে খাওয়া যাবে।

সুহাসিনী এসে মোটরে উঠলো হাজুর সঙ্গে–আলাপ করিয়া দিলাম। হাজু বললে–বৌঠাকরুণ, একদিন আপনার হাতের রান্না খেতে যাচ্ছি কিন্তু,–

সুহাসিনী বললে–সামনের রবিবার চলুন না সবাই। দিদি, মণ্টু, নীলিমা, অনিমা, সবাই যাবে।

হাজু হেসে বললে–সে হবে না। স্টেশন ছেড়ে বেশিক্ষণ কোথাও যাবার জো নেই আমার। খাবো গিয়ে সন্দের পরই। ঘণ্টা খানেক থাকবো। বাড়িতে এরা না থাকলে চলবে না, এরোড্রোমের সাহেব-সুবো আসে ঐ দিন বেড়াতে–তাদের চা-টা দিতে হবে। আমি ঠিক যাবো।

–মণ্টু, নীলিমা, অনিমাকে নিয়ে যাবেন কিন্তু।

BANGLADARSHAN.COM

চাকুলিয়া এরোড্রোমের নানা জায়গা ঘুরে কেনেডি বলে এক সাহেবের বাংলোয় হাজু মোটর নিয়ে হাজির হল। কেনেডি এরোড্রোমের গ্রাউণ্ড অফিসার এবং এন্‌জিনিয়ার। হুজুর সঙ্গে বিশেষ বন্ধুত্ব আছে বোঝা গেল। আমাকে, বিশেষ করে সুহাসিনীকে, খুব খাতির করলে। সুহাসিনী তো ভয়ে ও সঙ্কোচে জড়সড়। ছেলেমেয়েদের বিস্কুট, পনির, কলা প্রভৃতি খেতে দিল। আমাদের দিলে কফি। দেশী গান শুনতে নাকি বড় ভালবাসে শুনে আমি সুহাসিনীকে একটা গান করতে বললাম। সুহাসিনী গরীবের ঘরনী বটে, কিন্তু ভারি সুন্দর ওর কণ্ঠ, তবে সময়াভাবে চর্চা না হওয়ায় নতুন আর কিছু শিখতে পারে নি। রজনী সেনের একটা গান ও কেমন চমৎকার গাইলে। কেনেডি শুনে খুব খুশি। আমি বললাম, যেদিন আমাদের বাড়ি যাবে কেনেডিকেও নিয়ে যেও। সুহাসিনীও তাই বললে। কেনেডিকে আমি সুহাসিনীর অনুরোধে বুঝিয়ে দিলাম। কেনেডির খুশি আর ধরে না। সুহাসিনীকে বললে–মাই ইণ্ডিয়ান সিস্‌টার, আই মাস্‌ট কীপ ইওর ইনভিটেশন।

হাজুর বাংলোয় যখন আমরা ফিরে এলাম, তখন রাত আটটা। তখুনি আমাদের খাবার জায়গা হল। ঘি-ভাত, মাংস, মাছ, চাটনি, পায়েস ও সন্দেশ। বেশ রান্না। ঘি খুব ভাল। মুঙ্গের থেকে কে একজন ওকে এই ঘি নাকি এনে দেয়।

খাওয়া হয়ে গেলে স্টেশন-ওয়াগন তৈরি হয়ে এল আমাদের জন্যে। সকলের কাছে বিদায় নিয়ে মোটরে চড়ে আমরা রওনা হলাম। আবার সেই অরণ্যপথ ও মুক্ত প্রান্তর, জ্যোৎস্নাময়ী রজনী। আমাদের মন আনন্দে পূর্ণ। সমস্ত পথ সুহাসিনী কেবল সেই কথা বলতে বলতে এলো। বললে—আগে ভেবেছিলাম বড়লোকের কাণ্ড-কারখানা, না জানি কি বিপদেই পড়বো গিয়ে। কিন্তু এমন অমায়িক সবাই! দিদি তো মাটির মানুষ। তেমনি ঠাকুর-পো। সাহেবটাই বা কি ভাল লোক! ওদের কিন্তু ভাল করে খাওয়াতে হবে রবিবারে। আমি ছেলেমেয়েদের আসতে বলে দিয়ে এসেচি।

আমরা রাত দশটার সময়ে এসে নিজের খোলার ঘরের বাসায় পৌঁছলাম। উৎসাহ ও আনন্দে সুহাসিনী সারারাত প্রায় জেগেই রইল এবং শুধুই এরোড্রোম-ভ্রমণের নানা ঘটনার পুনরাবৃত্তি করতে লাগলো। সে জীবনে কখনো এমন মোটর-ভ্রমণ করে নি, এমন সুখাদ্য খায় নি, এতবড় দলের লোকের সঙ্গে মেশেনি। সবটা মিলিয়ে আজ তার জীবনের একটি অতি স্মরণীয় দিন। আমার তৃপ্তি এই ভেবে যে, আমার নিজের কোনো দিনও ক্ষমতা হত না ওকে এভাবে আনন্দ দিই—তবুও অপরের দৌলতে যা হয় একটু আমোদ আহ্লাদের মুখ দেখে নিলে একদিন।

—আচ্ছা, ওঁদের কি খাওয়াবো বল দিকি? সাহেবটা যদি আসে, আমাদের খাওয়া খাবে তো?

—ঘি-ভাত রাঁধতে পারবে না?

BANGLADARSHAN.COM

—খুব।

—মাংস আর ঘি-ভাত রেঁধো। পায়েসের দুধ কতটা লাগবে বলো তো?

—তা আড়াই সেরের কম নয়। সেও ধরো একটা টাকা। বাদাম, কিসমিস্ চাই।

—বাদাম নয়, পেস্তা বলো।

—ওই হল। পেস্তা।

—মাছ, কি মাছ আনবো?

—রুই কি কাৎলা এনো। কিন্তু মাছ কোথায় পাবে এ সময়? মনে হচ্ছে না যে মাছ পাবে। দেখো চেষ্টা করে। তোমার বন্ধুটি মাছ-মাংস খুব ভালবাসেন।

—কে বললে তোমায়?

—দিদি বলছিলেন।

—মুরগী খায় বলেচে?

–ওঃ, খুব। বাড়িতে মুরগী পোষে, পেছন দিকটাতে। না খেলে বাড়িতে মুরগী পোষে কেন?

শেষরাতের দিকে দুজনেই ঘুমিয়ে পড়লাম। ঘুমের মধ্যেও যেন বড় স্টেশন-ওয়াগনের গদি-আঁটা বেঞ্চিতে বসে চক্রাকারে মস্ত বড় রান্‌ওয়েটায় ঘুরচি...ঘুরচি...

–বাবু! বাবুজি! বাবু!

আগেই মোটর আসার শব্দ পেয়েছি। সেই স্টেশন-ওয়াগানটা। ছুটে বাইরে এলাম। সবে স্কুল থেকে এসে বসেছি হাত-পা ধুয়ে। বেলা পাঁচটা।

–কি ব্যাপার চাপরাসী সাহেব? বড় সাহেব পাঠিয়েছে বুঝি? চিঠি কই, দ্যায় নি?

–বাবুজি, বড়া সাব–নেহি হ্যায়। আজ বেলা করীব এক বাজে বহুৎ ভারী অ্যাকসিডেন্ট হুয়া দো নম্বর রান-ওয়েমে। পাত্থল ফাটাতা থা ডিনামাইটসে। বড়া সাব হুঁয়াপর হাজির থা–মগর ওহি পাত্থল ফাট কর্‌কে ছুটা বহুৎ দূরে। বড়া সাবকো মাথামে গিরা–একদম চুর হো গিয়া। মাইজিকো ফিট হুয়া, আবতক হুঁশ নেহি আয়া। কেনেডি সাহেবনে ভেজিন আপকো পাস–চলিয়ে। কেনেডি সাবকা চিট্টি হ্যায়–

সুহাসিনী বাইরে এসে বললে–কার চিঠি গা? ওঁরা আসবেন? হাজু ঠাকুরপো লিখেচে? কবে আসবে?

BANGLADARSHAN.COM

॥সমাপ্ত॥